

বাঁকুড়া জেলার লোকসাহিত্যে ধাঁধার ব্যবহার : একটি সমীক্ষা
সোনাই চ্যাটার্জী

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2026/01/17_Sonai-Chatterjee.pdf

সারসংক্ষেপ: ধাঁধা সংহত সমাজের ঐতিহ্যশ্রী জ্ঞানের ভাণ্ডার। জীবনচর্যার সার্থক পরিচয়বাহী রূপে ধাঁধা বহুকাল ধরে লোকায়ত মানুষের মনে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। যা সহজে বোঝা যায় না, বুঝতে গেলে একটু মাথা ঘামাতে হয়। যেখানে সূক্ষ্ম জ্ঞানের সঙ্গে নির্মল হাস্যরসেরও পরিচয় পাওয়া যায়, সেটিই হলো ধাঁধা। মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আমরা প্রথমে ধাঁধার সংজ্ঞা, প্রয়োজনীয়তা এবং পরে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রাপ্ত ধাঁধাগুলির মাধ্যমে মানুষের জীবন ও সমাজ বীক্ষার পাশাপাশি নানান প্রেক্ষিত খোঁজার চেষ্টা করব।

সূচক শব্দ: বাঁকুড়া, লোকসাহিত্য, ধাঁধা, গাজনোৎসব, বিবাহাচার, ঐন্দ্রজালিক, ক্ষেত্রসমীক্ষা, প্রয়োজনীয়তা, সমাজবীক্ষা।

সুবিশাল লোকসংস্কৃতি নামক সমুদ্রের ক্ষুদ্র অথচ উল্লেখযোগ্য একটি দ্বীপ হলো লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শ্রেণিবিভাগগুলির মধ্যে অতি তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিভাগ হলো ধাঁধা। পৃথিবীর নানা দেশে ধাঁধা প্রচলিত ছিল আদিবাসী সমাজে। তাঁরা মন্ত্রের কাজে, গোষ্ঠীপতি নির্বাচনে, পতি-পত্নী নির্বাচনে এমনকি অদ্ভুত সব লোকাচারে ধাঁধা ব্যবহার করত, এর প্রমাণ পাওয়া যায় জর্জ ফ্রেজারের ‘Golden Bough’ গ্রন্থে “ধাঁধা রহস্য সম্বন্ধে জর্জ ফ্রেজার প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাচীন বা থঞ্জা বা বান্টু জাতির বৃষ্টি-আবাহন উৎসবের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ উৎসবে আদিম সম্প্রদায়ভুক্ত নারীগণ সম্পূর্ণ উলজা হয়ে নৃত্য করে এবং বৃষ্টিকে আহ্বান জানিয়ে গান করে। এ সময় কোনো পুরুষ হঠাৎ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলে তারা ধাঁধা জিজ্ঞেস করে এবং সে ধাঁধার উত্তর অপেক্ষাকৃত অলীল ভাষায় না বলতে পারলে তাদের যথেষ্ট উত্তম-মধ্যম লাভ হয়।”^১ ধাঁধার ব্যবহার আমাদের এই ভারতবর্ষ ভূখণ্ডে সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে হয়ে আসছে। আদিম সমাজে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার অনুযোজ্য ধাঁধার চল ছিল, এই সম্পর্কে অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তীর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য — “আদিম সমাজে ধাঁধার ব্যবহার ছিল ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার অনুযোজ্য। বিবাহাচারের সঙ্গে ধাঁধার ছিল ওতপ্রোত সম্পর্ক। আমরা জানি বহুল পরিচিত গাজনোৎসবে সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রশ্নোত্তরমূলক যে ছড়া ব্যবহারের রীতি আছে, প্রকৃতিতে তা ধাঁধা ছাড়া কিছুই নয়। কোনো কোনো আদিম অধিবাসী বা উপজাতীয়দের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিতেও ধাঁধা ব্যবহারের চল রয়েছে।”^২ মনে করা হয় সবচেয়ে প্রাচীন ধাঁধার স্থান মেলে গ্রিস দেশে। মূলত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান থেকেই ধাঁধার উৎপত্তি বলা যেতে পারে, এজন্য বাংলা প্রাগাধুনিক সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন ‘চর্যাপদ’ গ্রন্থেও ধাঁধার উল্লেখ পাওয়া যায়। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির মতোই ধাঁধাও ঐতিহ্য পরম্পরায় সমাজ বক্ষে প্রবাহিত হয় তার নিজস্ব আঙ্গিকে। প্রথমে একজন ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্টি হলেও পরে গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমষ্টির সৃষ্টি রূপেই ধাঁধা আত্মপ্রকাশ করে, অন্যান্য বিভাগগুলির মতো এরও স্বতঃস্ফূর্ততা চোখে পড়ার মতো। ধাঁধারও সৃষ্টি সংহত সমাজের হাত ধরে। লোকসংস্কৃতির অনেক পণ্ডিত মনে করেন লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম ও গুরুত্বপূর্ণ শাখার নাম ধাঁধা। জর্জ ফ্রেজার তাঁর গ্রন্থে ধাঁধা সম্পর্কিত বিষয়টি নিয়ে জানিয়েছেন — “All harmonies and fitness, all his discrepancies and inconsistencies attract the notice of the children and child like me.”^৩ অর্থাৎ তার মধ্যে যে সামঞ্জস্য ও শোভা আছে, আবার যে অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি আছে — এই সবই শিশুদের মতো আমাদেরও আকৃষ্ট করে। এখন প্রশ্ন, ধাঁধা আমরা কাকে বলব? সাধারণ ভাবে একটি মাত্র ভাব বা বিষয়কে রূপকের সাহায্যে

জিজ্ঞাসার আকারে প্রকাশ করার একধরনের কৌশলের নাম ধাঁধা, একইসঙ্গে ধাঁধা ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ভান্ডার।

লোকসমাজের পরিশীলিত বুদ্ধির ছাপ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে ধাঁধার মধ্যে। গ্রামবাংলার বৃন্দ-বৃন্দা, যুবক-যুবতী প্রায় সকলেই ধাঁধার সঙ্গে কমবেশি পরিচিত। কোনো বিষয়কে ধ্বংসের মোড়কে নানা আঙ্গিকে রহস্যময় করে ধাঁধায় উপস্থাপিত করা হয়। ড. শীলা বসাকের মতে ধাঁধা, “শিল্প-সৌন্দর্যময় ও মননশীল রসবোধ্যতা ধাঁধার কথক ও শ্রোতাদের অঙ্গস্বরূপ। হাস্যরসিকতার মধ্য দিয়ে নির্মল আনন্দ পরিবেশন ধাঁধার ধর্ম। বুদ্ধির দীপ্তি, সৌন্দর্যের আশ্চর্য উপভোগ্যতা, হাস্যরসিকতা, চিন্তা ও মননের উৎকর্ষ, প্রতীকধর্মিতা ইত্যাদিই ধাঁধার মৌলিক বৈশিষ্ট্য।”^৪

গ্রামীণ লোকজীবনের গর্ভ থেকে প্রসূত লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বর্ণময় সম্পদ অঞ্চল বিশেষে নানা রূপ পরিগ্রহ করে। লোক মানসের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, লোকবিশ্বাসের অন্তরের সম্পদ ধাঁধাও এর ব্যতিক্রম নয়। ধাঁধার চিরন্তনতা মানুষকে যুগ যুগ ধরে আকর্ষিত করে চলেছে। এই গুণের কারণেই ধাঁধার অস্তিত্ব আলোচনার দাবি রাখে। ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি, লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিভাগগুলির তুলনায় ধাঁধার আলোচনা অনেকটা উপেক্ষিত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ বিষয়ে নীরব ছিলেন। শুধু আলোচনা নয়, এমনি কথায় কথায় ধাঁধা বাঁধাতে পারে মানুষের সংখ্যাও বেশ অল্প। আবার অনেক ক্ষেত্রে ধাঁধার উত্তর দেবার লোকেরও অভাব পড়ে। লোকসাহিত্যের এই শাখাটির কম ব্যবহার কেন? এটির অনুসন্ধান করতে গিয়ে যেটুকু বুঝেছি তা হলো ধাঁধা কোনো আসরে নিয়মিত অনুশীলন করা হয় না (যেমন, লোকসংগীত, লোককথা, লোকনাটক ইত্যাদির ক্ষেত্রে করা হয়), এছাড়া প্রবাদের ব্যবহার বেশি অংশে লক্ষ করা যায় বৃন্দ-বৃন্দাদের মধ্যে; কেননা তারা জীবন সম্পর্কে অনেক বেশি পরিণত মনস্ক। আর রইল বাকি ছড়া, তাও সময়ে সময়ে শোনা যায়; কিন্তু ধাঁধার চল সেদিক থেকে অনেকটাই কম। ধাঁধার শরীরকে দুটি ভাগে ভাগ করলে দুটি অংশ মেলে, প্রথমার্শে থাকে ভূমিকা, দ্বিতীয়াংশে থাকে শেষাংশ। চটজলদি ধাঁধার উত্তর দেওয়া হলে প্রশ্নকর্তার আগ্রহ অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়। একটু রয়ে বসে চিন্তা করে বা মাথা খাটিয়ে উত্তর দেওয়া হলে প্রশ্নকর্তা আরো কঠিন কঠিন ধাঁধা বলার উৎসাহ পায়, কোনো ধাঁধার উত্তর জানা থাকলে প্রশ্নকর্তা মৃদু মৃদু হেসে যে রসিকতা নির্মাণ করে তা যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন। সোজা কথায় ধাঁধাকে ‘mental recreation’ আখ্যায় অভিহিত করা যেতে পারে।

ধাঁধার প্রয়োজনীয়তা —

- (ক) ধাঁধার পিছনে একটি ধর্মীয় উপলক্ষ্য আছে যে, তা বলাই বাহুল্য। ধাঁধার মাধ্যমে যে রহস্য জাল বোনা হয় তা ভেদ করে কোনো অশুভ ও অতিপ্রাকৃত শক্তি নববিবাহিত বর বা বধূর কিংবা সদ্যোজাত শিশুর ক্ষতি করতে পারবে না। এই রকম আদিম বিশ্বাস একসময় সমাজে প্রচলিত ছিল।
- (খ) গোষ্ঠীর নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতা, ধ্যান ধারণা এবং অর্জিত জ্ঞানকে সংকেতের মধ্যে ধরে রাখা, যাতে সেগুলি অন্য গোষ্ঠীর হাতে না পড়ে।
- (গ) ধাঁধার উত্তর দিতে পারার মাধ্যমে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের বুদ্ধ্যাঙ্ক পরিমাপ করা যেত। আদিম গোষ্ঠীবন্ধ সমাজে বিশেষ বিশেষ পদ নির্বাচন করা হতো ধাঁধা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে।

বাঁকুড়া জেলার সংগৃহীত ধাঁধাসমূহ

বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রাম গঞ্জ থেকে ক্ষেত্রসমীক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধাঁধাগুলি সংগৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্ষেত্রসমীক্ষা বিষয়ের মূল যে তিনটি স্তর (সংগ্রহ-সংরক্ষণ-বিস্তার), তার ভিত্তিতেই বাঁকুড়া জেলার ধাঁধাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে লোকায়ত মানুষের মুখ থেকে। প্রাপ্ত ধাঁধাগুলিকে আমরা কয়েকটি বিভাগে শ্রেণি বিন্যস্ত করে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি —

ক) দৈনন্দিন জীবন বিষয়ক ধাঁধা — লোকজীবনের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রাত্যহিক কাজকর্মে, নানা জিনিসের অনুযোজ্য ধাঁধার ব্যবহার করা হয়।

“এত টুকুন গাছটি / ডাল তার পাঁচটি।”^৬

উত্তরঃ মানুষের হাতের পাঁচটি আঙুল। মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে ধাঁধার চল বহু পুরাতন একটি বিষয়। সাধারণত শিশুকে শিক্ষাদানের জন্য এই ধাঁধাগুলি বার বার করে শিশুর কাছে বলা হয়। সংখ্যার হিসেবের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম সম্পর্কেও শিশু অবগত হয়ে যায়। আবার গল্পের ছলেও এই ধাঁধাগুলি অনেক সময় পরিবেশন করা হয়। যেমন —

“সাঁই সুঁই ঘটকা / তিন মুড় দশ পা।”^৭

এক দাদু তাঁর নাতিকে গল্পের ছলে শিক্ষা দিচ্ছে, একটি মাটির হাঁড়িতে একজন লোক দুধ দোহন করছে; সেই অবস্থাকে দাদু ধাঁধার মাধ্যমে পরিবেশন করেছে। ‘ঘটকা’ হলো মাটির হাঁড়ি, ‘সাঁই সুঁই’ হলো দুধ দোহনের সময় যে শব্দ; আর ‘তিন মুড় দশ পা’ হলো দোহনে কর্মরত ব্যক্তি, বাছুর, গরু এদের সম্মিলিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-ব্যক্তি+বাছুর+গরু = তিনজনের তিন মাথা, এছাড়া তিনজনের সম্মিলিত পা এর সংখ্যা — দশ। এই বিষয়ে অন্য একটি ধাঁধার অবতারণা করা যেতে পারে, সেটি হলো, “পাঁচ ভাই বাই, দশ ভাই টানে।”^৮ সাধারণ ভাবে দেখলে মনে হতে পারে ধাঁধাটি কৃষিজ কোনো বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু বিষয়টি একেবারেই তা নয়, আসলে এখানেই ধাঁধার মজা। মূল বস্তুর অবতারণা না করে অন্য কিছু বলে মাথাকে ঘুরিয়ে দেওয়া। উক্ত ধাঁধার উত্তর হচ্ছে দাঁত মাজনের ব্রাশ ও জিহ্বা স্ক্র্যাপার, যাকে অনেকে জিভছুলা বলে। লোকায়ত মানুষরা মাজন হিসেবে নিম কাঠি বা সম্বর দাঁতনের কাঠি এবং একটি সরু বাঁশ কণ্টিকে মাঝে চিরে জিভ পরিষ্কার রাখে।

“সারাদিন মাটি খেলে

সন্ধ্যা হলেই বাড়ি ফেরে।”^৯

লোকায়ত সমাজের অর্থনীতির প্রধান মাপকাঠি হলো কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন, সেই দ্রব্যের সঠিক আমদানি-রপ্তানির সুব্যবস্থা করা। এই কৃষিকাজের জন্য দরকার পড়ে বিভিন্ন সামগ্রীর, যেমন — লাঙল, কোদাল, কাশ্তে, খুরপি ইত্যাদি। এই লোক জীবনে লোকপ্রযুক্তির বা লোকায়ত সামগ্রির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ধাঁধাটির উত্তর হলো লাঙল।

“তিন বর্ণের বিটি / মাথায় করে ঘষাঘষি

যখন বেশি করে ঘষে / ছাঁঁ গুলা ভাঁ করে কাঁদে।”^{১০}

উত্তরঃ চিরুনি। চিরুনি শব্দে তিনটি বর্ণের প্রয়োগ ঘটেছে। মাথায় চুল আঁচড়ানোর (বাঁকড়ি ভাষায় ছাড়ানো) জন্য তার ব্যবহার চলে আসছে। বলপূর্বক চিরুনি চালালে মাথায় ব্যাথা হতে পারে। লোককবির একটি অতি সাধারণ অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়কে ধাঁধার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

“এতটুকুন মাকড় / ভুঁইকে মারে চাপড়।”^{১১}

উত্তরঃ কোদাল। ‘ভুঁই’ এর অর্থ হলো মাটি, ‘মাকড়’ হলো কোদালের চ্যাপ্টানো অংশ। কোদাল মাটি কাঁটার কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়। চাষের সময় আঁড়ছাঁচ (নিজের জমিতে যেন কোনো ফুটো বা হাড় না থাকে, তা দেখা হয়) দেবার সময়, অসমতল জমি সমতল করার ক্ষেত্রে কোদাল কাজে লাগে। কোদালের বড়ো সংস্করণকে বাঁকড়ি ভাষায় ‘ফাঁফড়া’ বলে।

“বার ঘণ্টা জলে / সকাল-সন্ধ্যা দু-একশ গিলে।”^{১২}

উত্তরঃ ছোটো ডিঙা। বাঁকুড়ার ভূমি বুখা শুখা, বর্ষাকাল ব্যতীত (প্রকৃতি বিরূপ হলে এই ঋতুতেও)

“মুসলমানের রান্না / কুলিন কায়েতে খায়

যে না বলতে পারবেক / তার জাত জাবেক।”^{১৩}

উত্তরঃ খেজুর গুড়। মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা শীতের কিছুটা আগে নির্দিষ্ট স্থানে খেজুর গুড়ের মহলো বসায়। ভোরবেলা থেকে রস সংগ্রহ করে জ্বাল দেওয়া চলে, গুড় প্রস্তুত হলে তা বাজারে যায়। সেখান থেকে

সেই গুড় বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যায়।

খ) উদ্ভিদ বিষয়ক —

“ছামড়াতলায় ঘর / দেশ ছেড়ে বিদেশ যায়

বুড়া-ছোকরার মন মজাই।”^{১৩}

উত্তরঃ পান। ‘ছামড়াতলা’ অর্থ হলো খড় দিয়ে ছাওয়া ঘর, যোটিকে বরুজ বলা হয়। পান সেখান থেকে উৎপাদিত হয়ে, বাজারের চাহিদা মতো নানা স্থলে ছড়িয়ে পড়ে। সেই পান যুবক-যুবতী থেকে শুরু করে বাড়ির বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা খায়। এটিকেই লোক কবিরা সুচারুভাবে ধাঁধার মধ্য দিয়ে পরিবেশন করেছেন।

“ওপরে হাতির মত থাবা / নিচে আস্ত গাবা।”^{১৪}

উত্তরঃ ওল। ওল গাছ যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তারা জানেন, গাছের ডালপালা মোটা হয়; আর মাটির নিচে জন্মানো ওল ‘গাবা’ ভর্তি করে থাকে। ‘গাবা’ মানে হলো গর্ত। উক্ত ধাঁধায় চিত্রকল্পের ব্যবহার লক্ষণীয়। ‘গাছের উপরিভাগকে’ হাতির সঙ্গে এবং ‘ওল’ কে গর্তের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

“এতটুকুন কেঁষ্ট / খ্যাতে বড় মিষ্ট।”^{১৫}

উত্তরঃ বেগুন। বেগুন গাছের রং-কে কৃষ্ণ ঠাকুরের দৈহিক আবরণের সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। এখানে ‘অর্থতৎসম’ হয়েছে (কৃষ্ণ>কেঁষ্ট)। আঞ্চলিক ‘খ্যাতে’ মানে হলো ‘খেতে’।

“পৌষ মাসে কুঁড়ি / একটুকু দেরি হলে বুড়ি।”^{১৬}

উত্তরঃ সজনে (বাঁকুড়া ভাষায় সজনা) গাছের ফুল ও ডাঁটা। বাঁকুড়া জেলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সজনে গাছের ফলন ব্যাপক আকারে লক্ষ করা যায়। গাছটি ভেষজ গুণে ভরপুর। গাছের পাতা থেকে শুরু করে সবকিছুই মানুষের শরীরে কাজে লাগে। এই জন্যই বিজ্ঞানী মহলে গাছটি ‘মিরাকেল ট্রি’ নামে পরিচিত। বসন্ত কালের সময় এই গাছের ফল (ডাঁটা) খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পৌষ মাসের সময় গাছে ফুল আসে, তবে সময় মতো ডাল না কাটলে ডাঁটা বুড়ো হয়ে যায়। সেটিকেই লোক কবিরা ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

“আঁচিরে পাঁচিরে মাসির ঘর / ষোল মেগার এক বউ।”^{১৭}

উত্তরঃ মৌচাক। মৌচাক আঁচিরে পাঁচিরে দেখা যায়। গ্রাম্য মানুষরা স্ত্রীকে ‘মাগ’ এবং বর বা পুরুষ সঙ্গীকে ‘মেগো’ বলে। আলোচ্য ধাঁধায় পুরুষ মৌমাছিকে ‘মেগো’ এবং স্ত্রী মৌমাছিকে ‘মাগ’ বলে সম্বোধিত করা হয়েছে।

গ) বিবিধ বিষয়ক —

“কাঠের গাই পাথর গিলে

বেশি পানালে ক্ষীরটি জমে।”^{১৮}

উত্তরঃ চন্দন ঘষা। চন্দন ঘষা হয় চন্দন কাঠ দিয়ে একটি পাথরের উপর। যোটিকে চন্দন পেঁড়ি বলে। চন্দন কাঠ ঘষতে ঘষতে পাথর ক্ষয়ে যায়, এটিকে ‘গিলে’ খাওয়া বলা হয়েছে। আবার সেই কাঠ থেকে জমা পদার্থকে ‘ক্ষীর’ বলেছে লোকায়ত মানুষ।

“পাঁদ চ্যাপ্টা, মাথায় শুঁড়

বল রে মদনা ছাঁড়া, না বললে মেরে তকে শুঁই।”^{১৯}

উত্তরঃ চিংড়ি মাছ। চিংড়ি মাছের দৈহিক আকারকে ধাঁধায় ধরেছেন লোক কবিরা।

“ডম কাঁধে হাঁটে / সুযোগ পেলে উপর উপর বাজে”^{২০}

উত্তরঃ ঢাক, বাঁকুড়া জেলায় মূলত ডোমরা ঢাক বাজায় (এবার সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার খানিকটা পরিবর্তন হচ্ছে)। তারা লৌকিক পাল পার্বণ ছাড়াও দুর্গাপূজার সময় ভিন প্রদেশে ঢাক বাজাতে যায় (দিল্লি, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড)। ঢাক কাঁধে হেঁটে যায় বলে ডোমদের ঢাকি বলে সম্বোধন করা হয়। এই ধাঁধার

অপর একটি রূপ হলো, “কাঁধে আসে কাঁধে যায় / বিনা দোষে মার খায়।”

“ধর্মের নৌকা জলে ভাসে

পেট ধরে টেনে দিলে খলখলিয়ে হাঁসে।”^{২১}

উত্তরঃ প্রদীপ। সন্ধ্যা বেলায় তুলসী থানে প্রদীপ দেয় গ্রাম্য বধূরা, তাদের নিজেদের কথোপকথনে ধাঁধাটি তৈরি হয়েছে। তেলের মধ্যে প্রদীপের সলতে ভাসে। অনেক সময় প্রদীপে তেল কমে গেলে সলতে টেনে দিলে প্রদীপের আলো আবার আগের মতোই উজ্জ্বল হয়।

“আস্তে করে হাঁটে / মাঝে কালো পিপড়ায় টানে / আকাশ মুখে হাগে।”^{২২}

উত্তরঃ কেঁচো। কেঁচোর চলাফেরা বা তার গতিপ্রকৃতি নিয়ে এরকম ধাঁধা শোনা যায়। গ্রাম্য উঠোনে আজও কেঁচো মৃত্তিকা দেখা যায়। গৃহস্থের কেউ কেউ সেই মাটি নিয়ে গিয়ে উনুন লেপে, বাড়ির পাঁচিলের ফাটল বুজিয়ে দেয়। আবার লোক বিশ্বাস মতে এই মাটি ঘরে রাখলে দ্বিগুণ শস্য ফলন হয় তার খেতে।

“একটা বুড়ি / তার গলায় দড়ি / ঘুরে ঘুরে খায় / মাঝে মাঝে টান পড়লে খুলে পড়ে যায়।”^{২৩}

উত্তরঃ গরু বাঁধার খুঁটি। বাঁকড়ি ভাষায় গরু বা মোষ বাঁধার খুঁটিকে গোঁজ বলা হয়। গোঁজের মধ্যে গরু বাঁধা থাকে, যেখানে সবুজ ঘাস থাকে সেখানে খুঁটি পুতে গরু বাঁধা হয়। মাঝে মাঝে মাটি আলাগা হলে বা ভাল করে পোঁতা না হলে গোঁজ মাটি থেকে বেরিয়ে যায়। এই গরু বাঁধার প্রক্রিয়াটিকে বাঁকুড়ার মানুষ ‘দড়াবান’ বলে, তবে অঞ্চল ভেদে এর নামের রকমফের আছে।

বাঁকুড়া জেলা রাঢ় বাংলার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত একটি অত্যন্ত শুষ্কপ্রায় অঞ্চল, এখানকার সাধারণ মানুষ খুব কষ্ট করে তাঁদের জীবন অতিবাহিত করে। তাঁদের লৌকিক উৎসব, পালপার্বণ তথা জীবনচর্যাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য ধাঁধার জন্ম হতে দেখা যায়। জেলায় অঞ্চল ভেদে তাদের ভাষান্তর ঘটে, কোথাও একই ধাঁধার একাধিক রূপ লক্ষ করা যায়। আবার অনেক সময় জেলার সীমানা ছাড়িয়ে সেই ধাঁধাগুলি প্রবেশ করে অন্য জেলায়। লোকসাহিত্যের ধর্মই হলো পরিয়ানী পাখির মতো, এক স্থানের সংস্কৃতি অবলীলায় অন্য স্থানে মিশে যায়। শুধু ভাষাগত নিবিড় পর্যবেক্ষণই পারে তাদের সেই অঞ্চলের বলে দাবি করতে। আবার অনেক সময় উক্ত জেলার স্থানের উল্লেখ, শুধুমাত্র সেই জেলার সঙ্গে সম্পর্কিত পালাপার্বণের নামই পারে তাকে সেই এলাকার বলে চিহ্নিত করতে।

তথ্যসূত্র:

১. ‘লোক-সাহিত্য’ (প্রথম খণ্ড), আশরাফ সিদ্দিকী, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা ৬, পৃ. ১৩০
২. ‘লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধান’, বরুণকুমার চক্রবর্তী, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৪২২, পৃ. ৪৬
৩. ওই, পৃ. ৪৭
৪. ‘বাংলা ধাঁধার বিষয় বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়’, শীলা বসাক, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, পৃ. ৮

তথ্যস্বর্ণ: (সংগ্রহে সাহায্যকারী ব্যক্তিদের নাম)

৫. রিস্তা বাড়রি, গ্রাম — এস্তেশ্বর, ব্লক+থানা- বাঁকুড়া।
৬. গাজন রায়, গ্রাম — এস্তেশ্বর, ব্লক+থানা- বাঁকুড়া।
৭. সুমিত্রা গোস্বামী, গ্রাম — মুড়রা, শঙ্করহাটি, ব্লক+থানা- বাঁকুড়া।
৮. রঘু বাড়রি, গ্রাম — সায়েরপাড়া, ব্লক+থানা- বাঁকুড়া।
৯. লক্ষ্মী লোহার, গ্রাম — মুড়রা, শঙ্করহাটি, ব্লক+থানা- বাঁকুড়া।
১০. শক্তি ঘোষ, গ্রাম — ভাদুল, ব্লক+থানা- বাঁকুড়া।
১১. অরিন্দম ঘোষ, গ্রাম — ভাদুল, ব্লক+থানা- বাঁকুড়া।

১২. অচিন্ত্য ঘোষ, গ্রাম — ভাদুল, ব্লক+থানা- বাঁকুড়া।
১৩. তনিমা ঘোষ, গ্রাম — ভাদুল, ব্লক+থানা- বাঁকুড়া।
১৪. আদেশ মেটা, গ্রাম — মেটাপাড়া, ব্লক+থানা- বাঁকুড়া।
১৫. হাবু রায়, গ্রাম — রামসাগর, ব্লক+থানা- ওন্দা।
১৬. শিবধন মাঝি, গ্রাম — ওন্দা, ব্লক+থানা- ওন্দা।
১৭. নিতাই বাউরি, গ্রাম — ওন্দা, ব্লক+থানা- ওন্দা।
১৮. মিঠি বাউরি, গ্রাম — ওন্দা, ব্লক+থানা- ওন্দা।
১৯. সোনালি গোস্বামী, গ্রাম — রাধানগর, ব্লক+থানা- ইন্দপুর।
২০. অবুপ পাল, গ্রাম — রসিকনাগরপুর, ব্লক+থানা- ওন্দা।
২১. আশিষ ঘোষ, গ্রাম — ইন্দপুর, ব্লক+থানা- ইন্দপুর।
২২. গোবিন্দ পাত্র, গ্রাম — আড়ালবাঁশি, ব্লক+থানা- বাঁকুড়া।
২৩. শুভ লক্ষণ, গ্রাম — রাজগ্রাম, ব্লক+থানা- বাঁকুড়া।
২৪. রাহুল পাল, গ্রাম — রসিকনাগরপুর, ব্লক+থানা- ওন্দা।
২৫. উত্তম পাল, গ্রাম — রসিকনাগরপুর, ব্লক+থানা- ওন্দা।
২৬. তাপস পাল, গ্রাম — রসিকনাগরপুর, ব্লক+থানা- ওন্দা।
২৭. প্রশান্ত পাল, গ্রাম — রসিকনাগরপুর, ব্লক+থানা- ওন্দা।
২৮. পচা পাল, গ্রাম — রসিকনাগরপুর, ব্লক+থানা- ওন্দা।
২৯. রাজু ধল্ল, গ্রাম — বহড়াবাঁধ, ব্লক+থানা- ওন্দা।
৩০. সুমন্ত ধল্ল, গ্রাম — বহড়াবাঁধ, ব্লক+থানা- ওন্দা।
৩১. ভচ্চা বাউরি, গ্রাম — বহড়াবাঁধ, ব্লক+থানা- ওন্দা।

লেখক পরিচিতি: সোনাই চ্যাটার্জী, গবেষক, বাংলা বিভাগ, ভাষাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ।